https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বাংলাদেশের সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রে ভারতীয় সাহিত্যের অবদান

গৌরব সরকার[1]

সংক্ষিপ্তসার:

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সাহিত্যাশ্রিত চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৫৬ সালে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত ছিল। এরপর স্বাধীনতাপূর্বকালীন সময় থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো এ দেশের জাতীয় চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিশেষত, স্বাধীনতার পূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে ১৩% চলচ্চিত্র সাহিত্যনির্ভর ছিল, যার মধ্যে ভারতীয় সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের হার ছিল ৩৪%। জহির রায়হানের 'বেহুলা', সাদেক খানের 'নদী ও নারী', এবং মোহাম্মদ নজিবর রহমানের উপন্যাস থেকে নির্মিত 'আনোয়ারা' চলচ্চিত্রগুলো বাণিজ্যিক ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই সফল ছিল।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও সাহিত্যের প্রভাব চলচ্চিত্রে অব্যাহত থাকে। যেমন, ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম', মসিহউদ্দিন সাকের এবং শেখ নিয়ামত আলীর 'সূর্য দীঘল বাড়ী' প্রভৃতি। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বিকল্পধারার চলচ্চিত্রেও সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায়। তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না' ও গৌতম ঘোষের 'মনের মানুষ' প্রমাণ করে সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র কেবল ঐতিহ্যের অংশ নয়, বরং একটি সমৃদ্ধশালী ধারাও বটে।

বাংলাদেশে নির্মিত সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ভারতীয় বাংলা সাহিত্যের। সূর্চনার দিকে নির্মিত 'জাগো হুয়া সাভেরা', স্বাধীনতা পরবর্তীতে নির্মিত 'তিতাস', পরবর্তীতে গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি' ইত্যাদি একাধিক ভারতীয় সাহিত্য অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, নিহাররঞ্জন গুপ্ত, সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলেশ দে, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখের সাহিত্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বিশেষভাবে স্থান দখল করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশ এবং বাংলাদেশের সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রে ভারতীয় সাহিত্যের অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

AIJITR - Volume - 2, Issue - I, Jan-Feb 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

কীওয়ার্ড:

বাংলাদেশি সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্য ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, শরৎচন্দ্র এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

[1] পিএইচ.ডি. গবেষক, বিশ্বভারতী (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত), E-mail - sgourab35@gmail.com

AIJITR, Volume-2, Issue-I, January-February 2025, PP. 01-08.

Revised and accepted on 15th January 2025

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

১

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের ইতিহাস উনিশ শতকের শেষের দিকে শুরু হয়। ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ব্রেডফোর্ড সিনেমাটোগ্রাফি কোম্পানির মাধ্যমে। এটি ছিল গ্রিক ও তুরস্কের যুদ্ধ অবলম্বনে নির্মিত একটি চলচ্চিত্র। ই প্রদর্শনী ঢাকার মানুষের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। একই বছরের ৪ এপ্রিল হীরালাল সেন এবং তার ভাই মতিলাল সেন প্রতিষ্ঠা করেন ‘দ্য রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি’। ১৮৯৮ সালে বাংলাদেশের বাকেরগঞ্জ জেলার ভোলা মহকুমায় (বর্তমানে ভোলা জেলা) এসডিওর বাংলোতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়, এবং এই প্রদর্শন চলে সপ্তাহব্যাপী।

হীরালাল সেন চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরুর পর ১৯০০ সাল থেকে নিজেই চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোনিবেশ করেন। ১৫ এপ্রিল ১৯০০ সালে নববর্ষ উপলক্ষে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের বাড়িতে তাদের কোম্পানির মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৯০০ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে হীরালাল সেন ১২টি কাহিনি চিত্র, ১০টি তথ্যচিত্র এবং ৩টি বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেন। তার এই উদ্যোগ উপমহাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের সূচনা ঘটে ১৯২৭-২৮ সালে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক এবং নাট্য পরিচালক অম্বুজ প্রসন্ন সেনগুপ্ত প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নেন। তার পরিচালনায় নবাব পরিবারের তরুণদের সহায়তায় ‘সুকুমারী’ নামে একটি নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। নবাব পরিবারের সদস্যরা এই সিনেমায় অভিনয় করেন এবং নারী চরিত্রগুলোতেও পুরুষরা অভিনয় করেছিলেন। এই ৪০ মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রটি নবাব পরিবারের অভ্যন্তরে প্রদর্শিত হয়। এরপর একই তরুণ দল নির্মাণ করেন ‘দ্য লাস্ট কিস’ বা ‘শেষ চুম্বন’ নামে আরেকটি নির্বাক চলচ্চিত্র। নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯২৭ সালে এবং চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৩১ সালে ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে। এটি ছিল বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, যার দৈর্ঘ্য ছিল ৯০ মিনিট। বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু ভাষায় সাবটাইটেল যুক্ত করে এটি মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই চলচ্চিত্রে প্রথমবারের মতো নারী চরিত্রে নারীরা অভিনয় করেন, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

১৯৪৮ সালে ঢাকায় পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সফরকে কেন্দ্র করে নাজির আহমেদ নির্মাণ করেন এদেশের প্রথম তথ্যচিত্র ‘ইন আওয়ার মিডস্ট’। এটি পাকিস্তান শাসিত পূর্ব বাংলার প্রথম প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এরপর ১৯৫৪ সালে তিনি নির্মাণ করেন আরেকটি তথ্যচিত্র ‘সালামাত’।

প্রথম নির্মিত চলচ্চিত্র থেকে দীর্ঘ ৩০ বছরের ব্যবধানে ১৯৫৬ সালে নির্মিত হয় বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’। এটি পরিচালনা করেন আব্দুল জব্বার খান এবং তার লেখা নাটক ‘ডাকাত’ অবলম্বনে নির্মিত হয়। ৯৯ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন পূর্ণিমা সেন, সাইফুদ্দিন, বিনয় বিশ্বাস, জব্বার, ইনাম আহমেদ এবং জহরত আজরা প্রমুখ। ছবিটি ঢাকার রূপমহল, চট্টগ্রামের নিরালা, নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড এবং খুলনার উল্লাসিনী প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তি পায়। এই চলচ্চিত্র বাংলাদেশের সিনেমা দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং বাংলা চলচ্চিত্রের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৯৫৬ সালে ‘মুখ ও মুখোশ’ মুক্তির পর দুই বছর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এরপর ১৯৫৯ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’ অবলম্বনে এ. জে. কারদার নির্মাণ করেন উর্দু ছবি ‘জাগো হুয়া সভেরা’। একই বছরে তিনটি বাংলা ভাষার ছবি মুক্তি পায়—ফতেহ লোহানী পরিচালিত ‘আকাশ আর মাটি’, মহিউদ্দিন পরিচালিত ‘মাটির পাহাড়’ এবং এহতেশাম পরিচালিত ‘এ দেশ তোমার আমার’। ১৯৫৯ সালটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ বছর পরপর চারটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

১৯৬৫ সালে সাদেক খান হুমায়ুন কবিরের উপন্যাস 'নদী ও নারী' অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, যা বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস-ভিত্তিক চলচ্চিত্র। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে মোট ২১৪টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে বাংলা এবং উর্দু ভাষায়। এই সময়ের কয়েকটি (১৯৫৬-১৯৭১) উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র যেমন - ফতেহ লোহানী পরিচালিত 'আসিয়া' (১৯৬০), মুস্তাফিজ পরিচালিত 'হারানো দিন' (১৯৬১), সালাহউদ্দিন পরিচালিত 'সূর্যস্নান' (১৯৬২), জহির রায়হান পরিচালিত 'কাঁচের দেয়াল' (১৯৬৩), সুভাষ দত্ত পরিচালিত 'সুতরাং' (১৯৬৪), সালাহউদ্দিন পরিচালিত 'রূপবান' (১৯৬৫), বশীর হোসেন পরিচালিত '১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন' (১৯৬৬), জহির রায়হান পরিচালিত 'বেহুলা' (১৯৬৬), খান আতাউর রহমান পরিচালিত 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' (১৯৬৭), সুভাষ দত্ত পরিচালিত 'আবির্ভাব' (১৯৬৮), নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'পিয়াসা' (১৯৬৯), জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেওয়া' (১৯৭০), বাবুল চৌধুরীর 'টাকা আনা পাই' (১৯৭০), অশোক ঘোষের 'নাচের পুতুল' (১৯৭১) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী চলচ্চিত্রের ইতিহাস একদিকে যেমন নতুন উদ্যমে পথচলা শুরু করেছিল, তেমনি নানাবিধ বাধার সম্মুখীনও হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মোস্তফা মেহমুদ পরিচালিত 'মানুষের মন' মুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু করে। প্রথম বছরেই ৩০টি ছবি নির্মিত হয়, যার মধ্যে মাত্র ৪টি ছিল উর্দু ভাষায়। তবে এ সময় থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে এবং উর্দু চলচ্চিত্রের প্রভাব কমে যায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসনের কারণে চলচ্চিত্র শিল্পে একপ্রকার স্থবিরতা নেমে আসে। তানভীর মোকাম্মেল ও মোরশেদুল ইসলামের মতো নির্মাতারা প্রথাগত ধারার বাইরে গিয়ে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন, যা বিকল্প চলচ্চিত্র আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৭১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত সময়ে যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র যেমন 'ওরা ১১ জন', 'আগুনের পরশমণি', এবং ভিন্নধারার ছবি 'চাকা', 'লালসালু' উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের আরো কয়েকটি চলচ্চিত্রের নাম করা যেতে পারে – ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), সুভাষ দত্তের 'বসুন্ধরা' (১৯৭৭), আবদুল্লাহ আল মামুনের 'সারেং বৌ' (১৯৭৮), আমজাদ হোসেনের 'গোলাপী এখন ট্রেনে' (১৯৭৮), মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলীর 'সূর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৭৯), বাদল রহমানের 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী' (১৯৮০), আবদুল্লাহ আল মামুনের 'এখনই সময়' (১৯৮০), সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকির 'ঘুড্ডি' (১৯৮০), আমজাদ হোসেনের 'কসাই' (১৯৮০), মহিউদ্দিনের 'বড় ভালো লোক ছিল' (১৯৮২), আমজাদ হোসেনের 'দুই পয়সার আলতা' (১৯৮২), চাষী নজরুল ইসলামের 'দেবদাস' (১৯৮২), সি বি জামানের 'পুরস্কার' (১৯৮৩), আব্দুল লতিফ বাচ্চুর 'নতুন বউ' (১৯৮৩), সুভাষ দত্তের 'নাজমা' (১৯৮৩), আখতারুজ্জামানের 'প্রিন্সেস টিনা খান'(১৯৮৪), আমজাদ হোসেনের 'ভাত দে' (১৯৮৪), চাষী নজরুল ইসলামের 'চন্দ্রনাথ' (১৯৮৪), মোরশেদুল ইসলামের 'আগামী' (১৯৮৪), শেখ নিয়ামত আলীর 'দহন' (১৯৮৫), কামাল আহমেদের 'মা ও ছেলে' (১৯৮৫), তানভীর মোকাম্মেলের 'হুলিয়া' (১৯৮৫), বুলবুল আহমেদের 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত' (১৯৮৭), চাষী নজরুল ইসলামের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৯১), কাজী হায়াৎ-এর 'দাঙ্গা' (১৯৯১), তানভীর মোকাম্মেলের 'স্মৃতি একাত্তর' (১৯৯১), মোস্তাফিজুর রহমানের 'শঙ্খনীল কারাগার' (১৯৯২), গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৯৩), নাসিরউদ্দিন ইউসুফের 'একাত্তরের যীশু' (১৯৯৩), হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' (১৯৯৪), আখতারুজ্জামানের 'পোকা মাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৯৬), চাষী নজরুল ইসলামের 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৯৭) ইত্যাদি।

এই সময়ে অর্থনৈতিক সংকট, বিদেশি চলচ্চিত্রের আধিপত্য এবং প্রযোজনার অভাব সত্ত্বেও অনেক মহান নির্মাতা ও অভিনেতা আবির্ভূত হন, যারা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে গৌরবময় করে তুলেছেন। ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প একদিকে জাতীয় চেতনার প্রতীক হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে প্রথাগত বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে।

২০০০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে চলচ্চিত্রে নতুন ধারার সূচনা হয়েছে। এই সময়ে একদিকে বাণিজ্যিক ধারার ছবি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, অন্যদিকে বিকল্পধারার সাহসী নির্মাতারা সমাজের বাস্তবতা, মুক্তিযুদ্ধ, মানবিক সংকট ও সাধারণ মানুষের জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে প্রশংসনীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না' (২০০২) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত এই ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত। এছাড়াও 'রানওয়ে' (২০১০) এবং 'অন্তর্যাত্রা' (২০০৬) উল্লেখযোগ্য। মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'ব্যাচেলর' (২০০৪) নতুন প্রজন্মের জীবনের গল্প নিয়ে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র। এরপর 'থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নম্বর' (২০০৯), 'টেলিভিশন' (২০১২), এবং 'শনিবার বিকেল' (২০১৯) দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আবু সাইয়ীদের 'রূপকথার গল্প' (২০০৬), 'নিরন্তর' (২০০৭), এবং 'অপেক্ষা' (২০১০) বিকল্পধারার চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত গৌতম ঘোষের 'মনের মানুষ' (২০১০) লালন ফকিরের জীবন অবলম্বনে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র। নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর 'গেরিলা' (২০১১) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। ছবিটি মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনীর গল্পকে তুলে ধরেছে। আশরাফ শিশিরের 'গোপন' (২০১৩) এবং 'আমরা একটা সিনেমা বানাবো' (২০১৭) বিকল্প ধারার চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মেজবাউর রহমান সুমন পরিচালিত 'হাওয়া' (২০২২), রায়হান রাফি পরিচালিত 'পরাণ' (২০২২), ফারুকীর 'শনিবার বিকেল' (২০১৯) উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস একটি ক্রমবিকাশমান শিল্পধারা, যা ১৮৯৮ সালে প্রথম প্রদর্শনী থেকে শুরু করে নির্বাক যুগ, সবাক যুগ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। মুখ ও মুখোশের মতো চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে এদেশে চলচ্চিত্রের ভিত্তি শক্তিশালী হয়েছে। এর পরবর্তী সময়ে জহির রায়হান, সুভাষ দত্ত, ঋত্বিক ঘটকসহ আরও অনেক গুণী নির্মাতার হাত ধরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিতি লাভ করে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি পাওয়ার পাশাপাশি দেশের দর্শকদের মনোরঞ্জন করতেও এই সময়ের চলচ্চিত্রগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশি চলচ্চিত্র শিল্পের এই গতিময় ধারা ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়।

২

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতে সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের ভূমিকা বিশাল এবং তা শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণ মূলত সাহিত্যকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে গেছে। ১৯৫৬ সালে নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' সাহিত্যনির্ভর একটি চলচ্চিত্র ছিল। আব্দুল জব্বার খানের লেখা নাটক 'ডাকাত' অবলম্বনে নির্মিত এই ছবি ছিল বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতে সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রথম মেলবন্ধনের উদাহরণ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দেয়। ভাষার প্রতি এই আবেগ এবং নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরার ইচ্ছা চলচ্চিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিচালক আব্দুল জব্বার খান ভাষা আন্দোলনের পর অনুভব করেছিলেন, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নিজস্ব ধারা থাকা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে হাত দেন এবং ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় 'মুখ ও মুখোশ'। অবাঙালি চিত্রব্যবসায়ী ফজলে দোসানী বললেন, 'এখানকার আবহাওয়া খারাপ, আর্দ্রতা বেশি। কাজেই এখানে ছবি তৈরি সম্ভব নয়।'[i] এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে আব্দুল জব্বার খান চ্যালেঞ্জ করেন –

> কলকাতায় যদি ছবি হতে পারে তবে ঢাকায় হবে না কেন? আমি প্রমথেশ বড়ুয়াকে শুটিং করতে দেখেছি। কলকাতার কোন কোন নির্মাতাও এখানে এসে ছবির শুটিং করেছেন। তাহলে এখানে কেন ছবি হবে না? মি. দোসানি আপনি জেনে রাখুন, যদি আগামী এক বছরের মধ্যে কেউ ছবি না করে তবে আমি জব্বার খানই তা বানিয়ে প্রমাণ করব।[ii]

ভাষা আন্দোলনের পরে বাংলাদেশে সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহ বাড়তে থাকে। সাহিত্য ছিল সহজলভ্য এবং জনপ্রিয় মাধ্যম, যা দর্শকদের সাথে সহজেই সংযোগ তৈরি করত। ফলে বেশিরভাগ চলচ্চিত্র নির্মাতারা সাহিত্য থেকে কাহিনি গ্রহণ করে চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোযোগী হন।

১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়। যেমন ‘জাগো হুয়া সাভেরা’ (১৯৫৯) – আখতার জং কারদার পরিচালিত এই চলচ্চিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত। ছবিটি মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পায়। ‘সূর্যস্নান’ (১৯৬২) – সালাহ্উদ্দিন পরিচালিত এই ছবি আলাউদ্দিন আল আজাদের একটি ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত হয় এবং দর্শকদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে। ‘নদী ও নারী’ (১৯৬৫) – সাদেক খান পরিচালিত এবং হুমায়ুন কবিরের উপন্যাস থেকে নির্মিত এই ছবিটি ছিল বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র। ‘বেহুলা’ (১৯৬৬) – মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি অবলম্বনে জহির রায়হান পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি দর্শক ও সমালোচক মহলে প্রশংসিত হয়। ‘আনোয়ারা’ (১৯৬৭) – জহির রায়হানের পরিচালনায় নির্মিত এই চলচ্চিত্র মোহাম্মদ নজিবর রহমানের একই নামের উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়। এটি ব্যবসায়িকভাবে সফল হয় এবং এ সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে পরিণত হয়। তবে এই সময়ে সাহিত্যকে অবলম্বনে নির্মিত বেশিরভাগ চলচ্চিত্রই ব্যবসা সফল নয় –

> প্রসঙ্গত বিবেচ্য, সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রের পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও বাজার সম্ভাবনার বিপরীতে স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট ধারা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে নাই। আবার এও লক্ষণীয়, সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র সর্বত্রই যে বাজার লাভে ব্যর্থ হয়েছিল এমন নয়। আকবর হোসেন রচিত এবং কামাল আহমেদ পরিচালিত ‘অবাঞ্ছিত’ (১৯৬৯) চলচ্চিত্রটির ব্যবসা সাফল্য এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা - যদিও ‘অবাঞ্ছিত’ উচ্চমান সম্পন্ন শৈল্পিক উপন্যাস যে ছিল না তা বলাবাহুল্য।[iii]

স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের হার ছিল মোটামুটি ১৩%। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে নির্মিত মোট ২১৪টি চলচ্চিত্রের মধ্যে ২৭টি ছিল সাহিত্যনির্ভর। ২৭ টি ছবির মধ্যে একটি লোককাহিনি নির্ভর, সেটিকে বাদ দিয়ে মোট ২৬টি ছবির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ –

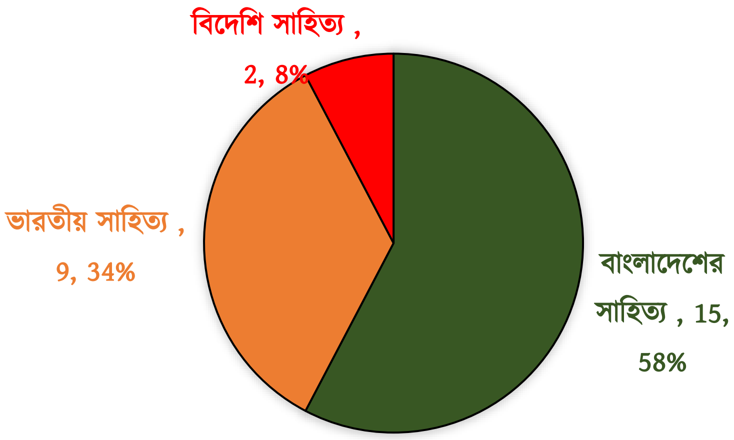

বাংলাদেশের সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের ৩৪ শতাংশ (৯টি) ভারতীয় বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’অবলম্বনে নির্মিত আখতার জং কারদারের ‘জাগো হুয়া সাভেরা’ (১৯৫৯), এবং আলমগীর কুমকুমের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ (১৯৬৯); বিধায়ক ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে ফতেহ লোহানীর ‘আকাশ আর মাটি’, (১৯৫৯); শচীন ভৌমিকের গল্প অবলম্বনে সুভাষ দত্তের ‘সুতরাং’ (১৯৬৪), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক অবলম্বনে খান আতাউর রহমানের ‘নবাব সিরাজদৌল্লা’

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

(উর্দু, ১৯৬৭); শৈলেশ দে'র উপন্যাস অবলম্বনে আমজাদ হোসেন ও নুরুল হকের 'আগুন নিয়ে খেলা' (১৯৬৭); শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'শহর থেকে দূরে' অবলম্বনে খান আতাউর রহমানের 'জোয়ার ভাটা' (১৯৬৯), শরৎচন্দ্রের উপন্যাস 'বৈকুণ্ঠের উইল' অবলম্বনে বশীর হোসেনের 'আপন পর' (১৯৭০) এবং মঞ্চনাটক শান্তিনিকেতন অবলম্বনে বশির হোসেনের '১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন' (১৯৬৬) চলচ্চিত্র। উপরের ছবিগুলোর মধ্যে 'জাগো হুয়া সভেরা', 'আকাশ আর মাটি', 'সুতরাং', 'নবাব সিরজদৌল্লা' বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নির্মাণ নৈপুন্য এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উন্নয়ের মাইলফলক হিসাবে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এই চলচ্চিত্রগুলোর।

এ. জে. কারদারের 'জাগো হুয়া সভেরা', উর্দু ছবি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' অবলম্বনে। তবে লেখকের নামের পরিবর্তন করে পাকিস্তানের জনপ্রিয় কবি ফয়েজ আহমেদের নাম ব্যবহার করা হয়েছিল, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণে। তৎকালে হিন্দুনাম ব্যবহারের সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল, সে কারণেই পরিচালক মানিকবাবুর নাম ব্যবহার করেন নি। এই ঘটনার জন্য ফয়েজ আহমেদ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ছবিটি নির্মাণ নৈপুণ্যের জন্য মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার পেয়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের সংস্কৃতিতে একটি নতুন দিকের সূচনা হয়, যেখানে চলচ্চিত্র জগতে সাহিত্যিক প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে জাতীয়তা, সামাজিক বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দিয়ে সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ সালে সুবোধ ঘোষের কান্তিধারা উপন্যাস অবলম্বনে রুহুল আমিন নির্মাণ করেন 'নিজেকে হারিয়ে খুঁজি'। এটি স্বাধীন বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র হিসেবে পরিচিত। একই বছরে সৈয়দ শামসুল হকের গল্প অবলম্বনে কাজী জহির পরিচালিত 'অবুঝ মন' মুক্তি পায়, যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতি অর্জন করে এবং ১৯৭৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়।

শুরুতে সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রগুলি তেমন শক্তিশালী অবস্থানে ছিল না, তবে ১৯৭৩ সালে ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' মুক্তি পাওয়ার পর উপন্যাস ভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা বাড়ে। এটি বাংলাদেশে সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে নির্মিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এক নতুন মাত্রা যোগ করে –

> স্বাধীন বাংলাদেশেও সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। তবে সে প্রয়াস খুব একটা শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচিত ও ঋত্বিক কুমার ঘটক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নামে'র মতো উপন্যাসের চলচ্চৈত্রিক প্রয়াস এদেশে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল।[iv]

স্বাধীন বাংলাদেশে সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা অব্যাহত থাকে, যদিও তা কখনোই খুব শক্তিশালী ছিল না। তবে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং চলচ্চিত্রের ভাষায় সাহিত্যিক সৃজনশীলতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটাতে সহায়ক হয়। এর পরের বছরে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে বেশ কিছু সাহিত্যানুষঙ্গিক চলচ্চিত্র তৈরি হয়, যেমন সি.বি. জামান পরিচালিত 'ঝড়ের পাখি' (১৯৭৩), সুভাষ দত্ত পরিচালিত 'বলাকা মন' (১৯৭৩), রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক' (১৯৭৬), সুভাষ দত্তের 'বসুন্ধরা' (১৯৭৭), এবং আবদুল্লাহ আল-মামুনের 'সারেং বউ' (১৯৭৮)।

১৯৭৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সূর্য দীঘল বাড়ি' ছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র। এটি আবু ইসহাকের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এবং বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত নারীদের সংগ্রামের গল্প তুলে ধরে। পরবর্তীতে, ১৯৮০ সালে নির্মিত 'এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী' (এরিখ ক্যাস্টনারের উপন্যাস অবলম্বনে) ছিল বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ সাহিত্য

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নির্ভর চলচ্চিত্র। এটি শিশুদের কল্পনা এবং সাহসিকতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয় এবং বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৯৫ সালে নির্মিত তানভীর মোকাম্মেলের ‘হুলায়া’ও উল্লেখযোগ্য।

হুমায়ূন আহমেদের ‘আগুনের পরশমণি’ (১৯৯৪) এবং নাসির উদ্দীন ইউসুফের ‘গেরিলা’ (২০১১) মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্র, যা ইতিহাস ও মানবিক দিক তুলে ধরে। তানভীর মোকাম্মেলের ‘লালসালু’ (২০০১), অনম বিশ্বাসে ‘দেবী’ (২০১৮) এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘মেঘমল্লার’ (২০১৪) সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সফল মেলবন্ধন। সরকারি অনুদানে নির্মিত সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রের মধ্যে সূর্য দীঘল বাড়ি (১৯৭৯), ‘আগুনের পরশমণি’ (১৯৯৪), ‘গেরিলা’ (২০১১) এবং ‘গোর’ (২০২০) উল্লেখযোগ্য, যা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। তবে, সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র বাংলাদেশে প্রাধান্য পায়নি, তবে এসব চলচ্চিত্র বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

১৯৭১-এর স্বাধীনতার পর থেকে ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্মিত সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে –

বাদিকের চার্টে বাংলাদেশের সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের ১৯৭১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত দশক অনুসারে মোট সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্র, সেই সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্য, ভারতের সাহিত্য এবং বিদেশি সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। ১৯৮১ থেকে ৯০ পর্যন্ত নির্মিত ভারতীয় সাহিত্যাশ্রয়ী বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ছিল সর্বাধিক। ক্রমান্বয়ে এই প্রভাব কমতে শুরু করেছে। ৯-২০-৩-৮-৬ এই ক্রমানুসারে। এই কমবার কারণ বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের প্রভাবও রয়েছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি হয়েছে, সে কারণ বিদেশি চলচ্চিত্রের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। আরো একটি বিষয় এখানে কাজ করেছে সেটি হল ভারতী যে সাহিত্যগুলো অবলম্বনে চলচ্চিত্রগুলো নির্মিত হয়েছে সেগুলোর রচনাকালকে লক্ষ্য করলে এই হ্রাস পাবার কারণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ‘৭১ পূর্ববর্তী ভারতীয় বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে। তখন পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য বিভাজনটা প্রকট হন। ধীরে ধীরে যা রাজনৈতিক কারণ একপ্রকার বিভেদের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে জনমানসে। এই বিভাজন নীতি দুই দেশের বাংলা সাহিত্য এবং শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

দ্বিতীয় চার্টে ১৯৭১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মোট সাহিত্যাশ্রয়ি চলচ্চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশের সাহিত্য, ভারতের সাহিত্য এবং বিদেশি সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা এবং শতাংশ দেওয়া হয়েছে। মোট শতাংশের বিচারে স্বাধীনতা পূর্ব এবং পরবর্তীতে ভারতীয় সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র একই আছে। কিন্তু একই সঙ্গে যদি বাংলাদেশে নির্মিত মোট চলচ্চিত্রের সংখ্যা দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের সংখ্যা দেখা যায় তাহলে দেখা যায় কি পরিমানে বাংলাদেশের সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৩১১৭ টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে মাত্র ১৩৪ টি সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্র যা মোট চলচ্চিত্রের মাত্র চার শতাংশ, স্বাধীনতা পূর্বের ছবিটি বরং কিছুটা ভাল ছিল। ১৯৫৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মোট নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ২১৪ টি, যার মধ্যে ২৭ টি সাহিত্যাশ্রয়ী। মোট চলচ্চিত্রের ১৩ শতাংশ। সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্রের এমন দশা দেখে সমালোচক শাহজাহান চোধুরী আক্ষেপ করে বলেছেন –

> আমাদের চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু সাহিত্য থেকে, তবু আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সাহিত্যের চিত্ররূপ যে কয়টা ছবি নির্মিত হয়েছে তাতে সত্যি দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের চলচ্চিত্রকারগণ যতবেশী নিজেদের কথা ভাবেনত তত সাহিত্য-শিল্পের কথা ভাবে না।[v]

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে যদি লক্ষ করা যায়, তবে দেখা যাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বিশ্বমানের করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে এই সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রগুলোই। তা সত্ত্বেও এই হ্রাসের তবে এই হ্রাসের সবচেয়ে বড় দায় নির্মাতাদের ওপরেই

বর্তায়। দ্বিতীয় দায়ভার যায়, প্রযোজক এবং তৃতীয় দায় হল মালিকদের। তাছাড়া সরকারেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। চলচ্চিত্রের অনুদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পক্ষপাতের দোষ বিশেষভাবে রয়েছে, যে কারণে প্রকৃত শিল্পমণা নির্মাতারা ভালো চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুকুল পরিকাঠামো পাচ্ছেন না। সুতরাং এই চিত্র বদলাতে হলে সকলের সৎ প্রচেষ্টা খুব প্রয়োজন।

যাই হোক স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারতীয় সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চলচ্চিত্র যেমন - সুবোধ ঘোষের কান্তিধারা উপন্যাস অবলম্বনে রুহুল আমিনের 'নিজেকে হারায়ে খুঁজি' (১৯৭২), অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৭৩), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প অবলম্বনে রাজেন তরফদার 'পালঙ্ক' (১৯৭৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে চাষী নজরুল ইসলামের 'দেবদাস' (১৯৮২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প 'রাজবাড়ী' অবলম্বনে কাজী হায়াতের 'রাজবাড়ী' (১৯৮৪), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস অবলম্বনে আবদুর রাজ্জাক পরিচালিত 'চাপাডাঙার বউ' (১৯৮৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস বুলবুল আহমেদের 'রাজলক্ষী শ্রীকান্ত' (১৯৮৭), গৌতম ঘোষের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৯৩), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে 'মনের মানুষ' (২০১০), সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে তাহের শিপন (বাংলাদেশ) ও মুকুল রায় চৌধুরীর (ভারত) 'হলুদবনি' (২০২০) ইত্যাদি।

ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অদ্বৈত মল্লবর্মণ,, নিহাররঞ্জন গুপ্ত, সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলেশ দে, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখের সাহিত্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বিশেষভাবে স্থান দখল করেছে।

সবচেয়ে বেশি যার রচনা গ্রহণ করা হয়েছে তাঁর নাম শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অনেক উপন্যাস যেমন দেবদাস, শ্রীকান্ত, বিন্দুর ছেলে ইত্যাদি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এই চলচ্চিত্রগুলো বাংলাদেশের দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ভারতীয় সাহিত্যের গভীরতা ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় করায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যেও চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রয়েছে। তাঁর নৌকাডুবি, রাজবাড়ী, পদ্মগোখরা গল্পগুলো চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো বাংলাদেশী দর্শকদের মধ্যে নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসও চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যের এক অনবদ্য কীর্তি, এটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। তাঁর কিছু উপন্যাস যেমন 'বিষাদ সিন্ধু' চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচায়ক।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতারা ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় যেমন নাটক, কবিতা, ছোটগল্প অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। এই সাহিত্যের মাধ্যমেই বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের গল্প বলার এক নতুন দিগন্ত খোলার সুযোগ পায়। বাংলাদেশে ভারতীয় সাহিত্য অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলি দুই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু হিসেবে কাজ করে, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সমৃদ্ধি ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

সবশেষে যেটি বলার সেটি হল, ভৌগোলিক সীমানায় দুই বাংলাকে পৃথক করা হয়েছে সত্য কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুই বাংলা বরাবরি একাত্মীভূত। জাতি এক, চলন-বলন এক, সংস্কৃতি এক - সবদিক থেকেই মিলন প্রতিপন্ন। তাই আলাদা করা মুশকিল কাজ। যে সাহিত্যগুলোর কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা দুই বাংলারই সম্পদ। রচনাগুলোর দিকে নজর দিলেই তার

Volume – 2 | Issue – I | January-February 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সাক্ষ মিলবে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ভারতীয় বাংলা সাহিত্যের যোগদান বিশেষ কৃতীত্ব বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খাটো করে দেখবার কোন অবকাশ নেই। বরং দুই বাংলার আদান প্রদান যত বেশি হবে, ততই একে অন্যের সঙ্গে মানসিক এবং সাংস্কৃতি সংযোগ বজায় থাকবে।

তথ্যসূত্র:

---

i লাবনী আক্তার, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সাহিত্যের রূপান্তর ও প্রাসঙ্গিকতা', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, জুন ২০২০, পৃ-৪৩।

ii লাবনী আক্তার, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সাহিত্যের রূপান্তর ও প্রাসঙ্গিকতা', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, জুন ২০২০, পৃ-৪৪।

iii আহমেদ আমিনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: আর্থসামাজিক পটভূমি (১৯৭০-১৯৮০ দশক)', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ-১১১।

iv আহমেদ আমিনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: আর্থসামাজিক পটভূমি (১৯৭০-১৯৮০ দশক)', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ-১১১।

v শাহজাহান চৌধুরী, 'বাংলাদেশের সাহিত্যের চিত্ররূপ', তানভীর মোকাম্মেল (সম্পা:), 'সেলুলয়েড', তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ-৩১।